ধোলাইখাল তথা প্রাইভেট সেক্টরে যন্ত্রনির্মাণ ব্যবসা : সমস্যা ও সম্ভাবনা

আশরাফ আলী

(১) অবতারণা

এই পরিসরে ধোলাইখালের যন্ত্রনির্মাণ সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আগেও লেখা হয়েছে। আমরা এর আগে বলেছি, যন্ত্রনির্মাণের মতো 'ক্যাপিটাল-ডুরেবোল গুড্স্' শিল্প একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী শিল্প। স্বদেশে যন্ত্রনির্মাণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে তা অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরের উপর কার্যকরী ও ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম। যন্ত্রনির্মাণ শিল্প এতটা শক্তিশালী যে, যন্ত্রনির্মাণ কারখানা নিজে নিজেকে 'ক্লোন' করতে সক্ষম ! স্বদেশে আরএণ্ডডি-সহ যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের শিকড় গাঁড়তে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কাজটি শুরু করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টরে যন্ত্রনির্মাণের তেমন সুযোগ তৈরী হয়নি। নানান সমস্যার ভিতর দিয়ে ধোলাইখালের যন্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলি কোন রকমে টিকে আছে। আজকের নিবন্ধে ধোলাইখালস্থ নির্মাতাদের কাজ, তাঁদের সফলতা ও ব্যর্থতা এবং সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। আশা করি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী নীতিনির্ধারকসহ সকল স্তরের জনগণ এই নিবন্ধে আলোচিত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে উপকৃত হবেন।

১৯৯৪ সনের জানুয়ারী ২৯ - ফেব্রুয়ারী ১২ তারিখে প্রকাশিত 'শিল্পবাজার : শিল্প ও বাণিজ্য' পত্রিকায় সামসুজ্জামান বিশ্বাস ''ধোলাইখাল : প্রয়োজন হলো সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা'' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান নিবন্ধটি এই প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বর্তমান লেখক ১৯৯৩-১৯৯৪ সালের দিকে একাধিকবার ধোলাইখাল এলাকা পরিদর্শনে যান এবং ধোলাইখালের নির্মাতা ও মালিক সমিতির অফিসারবৃন্দের সাথে বিস্তারিত আলোচনায় শরীক হন। সেইসব আলাপ-আলোচনার সারমর্মও এই নিবন্ধে যোগ করা হয়েছে।

(২) পটভূমি

ধোলাইখাল নামে পরিচিত এলাকাটি আয়তনে তিন বর্গ মাইল এবং গুলশান থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত। বর্তমানে ধোলাইখাল এলাকায় প্রায় ২,০০০টি ছোট ও মধ্যম আকৃতির মেটালওয়ার্ক ফ্যাক্টরী রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই এলাকার কারখানা-মালিকসম্প্রদায় এই ফ্যাক্টরীগুলির কয়েকটি পুরোনো যন্ত্রপাতি মেরামত ও বিক্রির ওয়ার্কশপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমশঃ তাঁরা স্থানীয় চাহিদা পূরণার্থে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন শুরু করেন।

বর্তমানে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার কর্মী ধোলাইখালের ফ্যাক্টরীগুলিতে কর্মরত রয়েছে। প্রতি বছর আট থেকে দশ হাজার নতুন দক্ষ কর্মী এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এখন বিভিন্ন পদ ও মানের নানা ধরণের যন্ত্রপাতি এখানে নির্মিত হচ্ছে। কিছু কিছু উৎপাদিত যন্ত্র বেশ জটিল এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রের তুলনায় এগুলির গুণাগুণ মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য। উনিশশো আশির দশকের শুরু থেকে ধোলাইখালে নির্মিত যন্ত্রপাতি স্থানীয় বাজারে কদর পেতে শুরু করে। আশি দশকের শেষ ও নব্বুই দশকের শুরুর দিকে এই যন্ত্রগুলি বাংলাদেশের বাইরেও সুনাম অর্জন করতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ, সৌদী আরবের রিয়াদ

শহরের আল-গ্যালিনি কোম্পানী ১০,২৭২ মার্কিন ডলার মূল্যে ছয়টি লেদ মেশিন ক্রয় করে। সৌদী ক্রেতারা লেদ মেশিনের গুণাগুণে এতটা খুশী হন যে, তাঁরা এগুলির নির্মাতা ওস্তাদ গিয়াসউদ্দীনকে নিজ খরচে সৌদী আরব সফরে নিয়ে যান।

(৩) ধোলাইখালে নির্মিত যন্ত্রপাতি

ধোলাইখাল নির্মাতাদের কৃতিত্ব সাধারণ বাংলাদেশী মানুষের কাছে মূলতঃ অজানাই রয়ে গিয়েছে। একই ভাবে যন্ত্রনির্মাণকারী বিশাল সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অস্তিত্বশীল প্রচণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কেও জনসাধারণ তেমন খোঁজ খবর রাখে না। এমন কি উচ্চ শিক্ষিত দেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখনো মনে করেন, বাংলাদেশ একটি সূচ অথবা নাট-বল্টু নির্মাণের যোগ্যতাও রাখে না। এক সময় ধোলাইখাল নির্মাতাদের ''পুরোনো যন্ত্র ক্রেতা-বিক্রেতা'', ''নকলবাজ'', বা ''উন্নতমানের কামার'' নামে অভিহিত করা হতো। এখন ধোলাইখাল সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে গেছে। এখন বলা হয়, খুব কম যন্ত্রই আছে যা ধোলাইখালের নির্মাতারা নির্মাণ করতে অক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে ধোলাইখাল এলাকায় এত বেশী সংখ্যায় ও বিচিত্র মানের ছোট-বড় যন্ত্র, খুচরো যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণ হয় যে, এগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করা খুব কঠিন। ধোলাইখাল নির্মাতাদের তৈরী কয়েকটি যন্ত্রপাতি ও খুচরো যন্ত্রের তালিকা এখানে দেওয়া হলো:

মোটরগাড়ী, রেলওয়ে, চিনিকল, জুটমিল ও টেক্সটাইল মিলের খুচরো যন্ত্রাংশ; বল প্রেস, পাওয়ার প্রেস, পাওয়ার লুম, হাইড্রলিক প্রেস, প্লাস্টিক মেশিন, লাইনার, পিস্টন ও পিস্টন রিং লোড স্প্রিং, নাট-বল্টু, তালা, বাংলাদেশ বিমানের গ্রাউণ্ড ইকুপমেন্টের খুচরো যন্ত্রাংশ, ফ্যান ও বৈদ্যুতিক মোটর, আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে নির্মিত বিস্কুট তৈরীর মেশিন, মোটর, সার কারখানার জন্য আধুনিক মানের খুচরো যন্ত্রাংশ, তিতাস গ্যাস মেশিনারীর জন্য খুচরো যন্ত্রাংশ, সেলাই মেশিন, উঁচু মানের স্যানিটারী বাথরুম ফিটিং, হার্ডওয়ার দ্রব্যাদি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য খুচরো যন্ত্রাংশ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জন্য খুচরো যন্ত্রাংশ, ওয়াশার জন্য খুচরো যন্ত্রাংশ, বিবিধ মেশিনের খুচরো যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন আকারের লেদ মেশিন, মিক্সার মেশিন, গ্যাস স্টোভ, থ্রেড মেশিনের জন্য প্লাস্টিক ডাইস, তিন চাকার অটো টেম্পো, গাড়ীর রেডিয়েটর।

(ক) স্যানিটারী বাথরুম ফিটিং : ধোলাইখাল নির্মাতাদের তৈরী একটি অন্যতম পণ্যদ্রব্য হলো স্যানিটারী বাথরুম ফিটিং। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে এই ফিটিংগুলি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করা হতো। স্বাধীনতার পর এই ফিটিং নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ধোলাইখাল নির্মাতারা অগ্রণী ভূমিকা নেন। বর্তমানে ধোলাইখালের প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি কারখানা স্যানিটারী বাথরুম ফিটিং উৎপাদনে নিয়োজিত আছে। এই কারখানাগুলিতে প্রায় ২,০০০ জন কর্মী কর্মরত আছে। এখানে নির্মিত ফিটিংগুলি আন্তর্জাতিক মানের। ধোলাইখালের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন ফিটিং সারা দেশের পুরো চাহিদা মিটিয়ে আরো বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত থেকে যায়।

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সরকার স্যানিটারী বাথরুম ফিটিংসহ কিছু কিছু যন্ত্রাংশের উপর আমদানী নিষেধাজ্ঞা জারী করে। এর ফলে এই শিল্প বেশ পসার লাভ করে। পরবর্তী সরকার এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। শুধু তা-ই নয়, বরং স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট বসিয়ে দেয়। তাতে ফিটিং বিক্রয়ের পর বিনামূল্যে মেরামতের অঙ্গিকার দেওয়া সত্ত্বেও ধোলাইখালের নির্মাতারা বেশ অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যান।

(খ) পাওয়ার লুম : ধোলাইখালে নির্মিত আরেকটি পণ্য হলো পাওয়ার লুম। ৫০/৬০টি কারখানায় ৬০০/৭০০ জন কর্মী পাওয়ার লুম নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে। স্থানীয় টেক্সটাইল মিলগুলি এখানে নির্মিত পাওয়ার লুম ব্যাপকহারে ব্যবহার করে। গুণগত মান উঁচু হবার কারণে

সম্প্রতি এগুলির চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। আসলে, নির্মাতারা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে যথেষ্ট সংখ্যায় উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছেন না। স্থানীয়ভাবে নির্মিত পাওয়ার লুমের দামও আমদানীকৃত ইউনিটগুলির চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ, ধোলাইখালের কারখানায় নির্মিত এক ইউনিট পাওয়ার লুমের দাম ৩২/৩৭ হাজার টাকা। অপরপক্ষে, আমদানীকৃত একটি পাওয়ার লুম এক লক্ষ টাকারও বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। তবে রিকণ্ডিশাণ্ড জাপানী পাওয়ার লুম ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে যা স্থানীয় নির্মাতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

(৪) ধোলাইখাল মালিক সমিতি

প্রায় চারশত জন ধোলাইখাল কারখানা মালিক মিলে 'ঢাকা জেলা ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক ও মেরামত কারখানা মালিক সমিতি' বা সংক্ষেপে 'মালিক সমিতি' নামের এক সমিতি গঠন করেছেন। সমিতির প্রেসিডেন্ট তাজিজুল হক মাস্টার এবং সাধারণ সচীব শাহ আলম চুন্নু মিয়া ধোলাইখাল যন্ত্রনির্মাতাদের কলাকুশল ও নির্মাণক্ষমতার ব্যাপারে খুবই আস্থাবান, নিশ্চিত ও গর্বিত। তাজিজুল হক মাস্টারের মতে ধোলাইখাল নির্মাতারা অত্যাধুনিক মেশিনারী নির্মাণে পারদর্শী। তিনি বলেন, ''আমরা কোন্ কোন্ যন্ত্র নির্মাণ করতে পারি প্রশ্ন তা নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে এমন কোন যন্ত্র আছে কিনা যা আমরা নির্মাণ করতে পারি না? এইসব নির্মাণক্ষমতা সরকারের কোন সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই আমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও অর্থ দিয়ে গড়ে তুলেছি।''

তাজিজুল হক মাস্টার এবং চুন্নু মিয়া সহ মালিক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সরকার আরোপিত ১৫% ভ্যাট নিয়ে খুবই অসুখী ও উদ্বিগ্ন। তাঁরা মনে করেন, সরকার যদি ভ্যাট তুলে না নেয় এবং লাগামছাড়া আমদানী বন্ধ না করে তাহলে দুই এক বছরের মধ্যেই ধোলাইখালের অধিকাংশ কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। অবাধ আমদানীর কারণে ইতিমধ্যে অনেক প্রোডাকশান লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

চুন্নু মিয়ার মতে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য ধোলাইখাল নির্মাতাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটির দরকার তা হলো একটি সার্ভিস সেন্টার। সার্ভিস সেন্টারটি মূলতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত মান বাড়ানোর কাজে নিবেদিত থাকবে। এই ধরণের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণসহ নির্মাণ কাজে প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা এবং কারখানা মালিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। চুন্নু মিয়া বলেন, ধোলাইখালের পণ্য উঁচুমানের হলেও সেগুলি ভারত থেকে নিম্নমানের পণ্য আমদানীর কারণে বাজার হারাচ্ছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভারতীয়রা নিম্নমানের পণ্যের বাইরে চাকচিক্যপূর্ণ মোড়ক লাগিয়ে সেগুলি বাংলাদেশে রপ্তানী করে। অনেক সময় ভারতে নির্মিত পণ্যের গায়ে অন্য দেশের 'লেবেল' লাগিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানী করা হয়। এছাড়া আমাদের দেশের একদল অসাধু ব্যবসায়ী ভারতীয় পণ্যের গায়ে বিদেশী 'লেবেল' লাগিয়ে বাজারজাত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের সরকারের এই ধরণের অনিয়মের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ।

উনিশশো আশির দশকের শুরু থেকে ১০/১২ বছরের মধ্যে ধোলাইখালের কারখানা মালিকরা নির্মাণ কলাকৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছেন। বর্তমান সরকারের উন্নয়ননীতির তুলনায় অতীত সরকারের উন্নয়ননীতিমালা প্রকৌশল সেক্টরের প্রবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের অধিকতর অনুকূল ছিলো। স্থানীয় প্রকৌশল সেক্টর রক্ষার্থে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১২ ফুট পর্যন্ত লেদ মেশিনসহ অনেকগুলি প্রকৌশলী পণ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু পরবর্তী সরকার অজানা কারণে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। এছাড়া নিম্নমানের ভারতীয় মেশিনারী অবৈধভাবে বাংলাদেশে আমদানী হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বাজার বেদখল করে নিচ্ছে। এতে স্থানীয় পণ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

চুন্নু মিয়ার নেতৃত্বে ধোলাইখাল এলাকার একুশটি কোম্পানী মিলে ‘‘ডাইনামিক কনসোর্টিয়াম’’ নামের একটি ম্যানুফ্যাকচারিং জোট তৈরী করে। এই জোট মোটরগাড়ীর খুচরো যন্ত্রাংশ, মোটর সাইকেল, বেবি ট্যাক্সি এবং টেম্পো নির্মাণকাজে নিয়োজিত থাকার কথা। ডাইনামিক কনসোর্টিয়ামের দশটি কোম্পানী মিলে ১৯৮৭ সনে ২০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে পরীক্ষামূলকভাবে ছয়টি টেম্পো নির্মাণ করে। টেম্পোটির নাম দেওয়া হয়েছিলো ‘‘অগ্রদূত’’। সরকারী সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাবে টেম্পোটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনে যায়নি; হলে প্রতিটি ইউনিট ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করা যেতো। ইতিমধ্যে ভারতীয় টেম্পো বাংলাদেশী বাজার দখল করে নেয় - ভারতীয় ‘কৃষাণ’ প্রতি ইউনিট ১,২৫,০০০ টাকায় এবং ’ভেস্পা’ প্রতি ইউনিট ১,৭৫,০০০ টাকায় বাংলাদেশী বাজারে বিক্রি হয়।

ক্লাস প্লেট্স, ব্রেক লাইনিং, ব্রেক সুজ, কন্ট্রোল কেব্‌ল, গিয়ার কেব্‌ল, ইত্যাদি নির্মাণকাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়েই মূলতঃ ১৯৯৩ সনের দিকে ডাইনামিক কনসোর্টিয়াম চারটি ভারতীয় কোম্পানী (ম্যাকিনো, পাঞ্জাব বেভেল গিয়ার্স, গোয়ালিয়র অটোমোবাইলস এবং এস. কে. এন্টারপ্রাইজ)-এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। কনসোর্টিয়ামের পরিকল্পনা ছিল মোটর সাইকেল ও টেম্পোর খুচরো যন্ত্রাংশ নির্মাণ দিয়ে কাজ শুরু করা এবং পরে ক্রমশঃ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে পুরো মোটর সাইকেল, বেবি ট্যাক্সি এবং টেম্পো নির্মাণে যাওয়া। এই পরিকল্পনাধীনে ভারত থেকে ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স আমদানীর প্রয়োজন হবে; অবশিষ্ট যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে নির্মিত হবে। ডাইনামিক কনসোর্টিয়াম পুরো উৎপাদনে গেলে আরো ৫০০টি সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিট কনসোর্টিয়ামের কর্মকাণ্ড থেকে উপকৃত হবে। এই উদ্যোগ সফল হলে সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার পুরোটা মেটানো সম্ভব হবে।

সার্ভিস সেন্টার ছাড়াও ধোলাইখাল নির্মাতাদের একটি ‘হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট’-এর আশু প্রয়োজন। এছাড়া নির্মাণ-ব্যবসা বাড়ানোর জন্য তাঁদের পুঁজি ও জমি, পণ্যদ্রব্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি এবং বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য কাজের মধ্যে সরকারকে এই নির্মাণশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও অন্যান্য উপাদানের উপর আরোপিত শুল্ক কমাতে হবে এবং এই শিল্পগুলির উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে।

সারা জাতির সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী যেসব পুরোনো ও কঠিন সমস্যায় আক্রান্ত ধোলাইখালের নির্মাতারাও স্পষ্টতঃ সেই একই সমস্যায় ভুগছেন। রাজনীতিবিদ, আমলা ও ইনডেন্টারসহ বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার ছাড়া যে-কোনো পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক - তা সে পরিকল্পনা যত নিরেট বা নির্ভুলই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ ডাইনামিক কনসোর্টিয়াম ও ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটির কথা ধরা যাক। এই চুক্তির ফলে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মূল্য হিসাবে ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে সরাসরি টাকা শোধ করতে হবে। কিন্তু এ তো গেলো সামান্য ব্যাপার। পরবর্তী পর্যায়ে হস্তান্তরিত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলি থেকে অত্যন্ত উচ্চমূল্যের ভারী মেশিনারী কেনার প্রয়োজন পড়বে।

এই ধরণের বিশাল বিনিয়োগ কেবল তখনই সফল হতে পারে যখন এবং যদি হস্তান্তরিত প্রযুক্তির সাহায্যে নির্মিত পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য ডাইনামিক কনসোর্টিয়াম কমপক্ষে বাংলাদেশী আভ্যন্তরীণ বাজারের বড় একটি অংশ হাতে পায়। আগেও বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে স্থানীয় নির্মাতারা কারো করুণা বা দয়া-দাক্ষিণ্য চান না, তাঁরা চান উন্মুক্ত বাজারে ‘সমাধিকারভিত্তিতে’ অংশগ্রহণ করার ন্যায্য অধিকার। তার জন্য অন্যায্য শুল্ককাঠামো সংস্কার করতে হবে, স্থানীয়ভাবে নির্মিত মেশিনারীর উপর আরোপিত ‘ভ্যাট’ প্রত্যাহার করতে হবে এবং পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এগুলো বাস্তবায়িত করতে না পারলে ডাইনামিক কনসোর্টিয়ামের এই প্রকল্পে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

(৫) শেষকথা

কয়েক বছর হলো চুন্নু মিয়া ইন্তেকাল করেছেন। কয়েক মাস আগে তাজিজুল হক মাষ্টার সাহেবও মারা গেছেন। ধোলাইখাল মালিক সমিতি এখন আর ততটা সক্রিয় নেই। এর বদলে বর্তমানে ‘‘বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন’’ (বি-ই-আই-ও-এ) একই ধরণের ভূমিকায় কাজ করে যাচ্ছে। বি-ই-আই-ও-এ প্রতিষ্ঠানটির বিশ্লেষণ অনুসারে বাংলাদেশের শুল্ককাঠামোতে বেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উনিশ শো নব্বুই দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যন্ত্রনির্মাণে ব্যবহৃত কাঁচামাল/উপাদানের উপর ৫০% থেকে ১৫০% হারে শুল্ক বসিয়ে দেওয়া হতো। এই ধরণের অস্বাভাবিক উচ্চ শুল্কহার নির্ধারণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বদেশে উচ্চমূল্যের যন্ত্রনির্মাণ কাজকে নিরুৎসাহিত করা। সেই হার বর্তমানে সর্বোচ্চ ২২.৫%-এ কমিয়ে আনা হয়েছে। তবে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রের উপর বসানো শুল্কহার (৫% থেকে ৭%) আনুপাতিকভাবে ততটা বাড়ানো হয়নি।

কাঁচামাল ও আমদানীকৃত যন্ত্রের উপর আরোপিত শুল্কহারের তারতম্য দেশী যন্ত্রনির্মাতাদের উপর এখনো প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশী যন্ত্র-বাজারের সিংহভাগ এখনো বিদেশ থেকে আমদানীকৃত যন্ত্র দ্বারা মেটানো হচ্ছে। ফলে ‘‘আর-এণ্ড-ডি’’ কাজে বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্ব পুঁজি স্বদেশী নির্মাতারা সঞ্চয় করতে পারছেন না। আমরা জানি সঠিক আর-এণ্ড-ডি ছাড়া পণ্যদ্রব্যের মান ঈপ্সিত পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে না এবং স্বদেশী নির্মাতারা দেশী-বিদেশী বাজারে ন্যায্যভাবে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবেন না।